পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও প্রজননস্বাস্থ্য

মুহাম্মদ আনওয়ারুস সালাম

গণমাধ্যমের বিভিন্ন শাখা, যেমন সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র বা বিজ্ঞাপনে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিয়ে অনেক গবেষণা এদেশে হয়েছে। তবে পাঠ্যপুস্তকের জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিয়ে বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হলেও ধারাবাহিকভাবে কোনো 'জোরালো' গবেষণা হয় নি। এই শূন্যতা পূরণের দায় কাঁধে নিয়ে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ ২০১০ ও ২০১২ সালে যথাক্রমে 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা, এইচআইভি/এইডস ও প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষা : জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা-উপকরণ পর্যালোচনা' এবং 'রচনা ও অলংকরণের দৃষ্টিভঙ্গি : নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকের জেন্ডার সংবেদনশীলতার স্বরূপ বিশ্লেষণ' শীর্ষক দুটি গবেষণা পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থাটি ২০১৩ সালে 'মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও প্রজননস্বাস্থ্য : ২০১৩ সালে মাধ্যমিক শ্রেণিতে পাঠ্য বইয়ের বিষয় বিশ্লেষণ' নামে তাদের সর্বশেষ গবেষণাটি পরিচালনা করে। আমি শেষোক্ত দুটি গবেষণাকাজে গবেষকদলের একজন হিসেবে যুক্ত ছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, আমাদের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে এখনো জেন্ডার অসংবেদনশীল উপাদান বিদ্যমান রয়ে গেছে, যা দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন।

স্বাভাবিক কারণেই গবেষণা দুটির মুদ্রিত কপি সকল স্টেকহোল্ডারের কাছে পৌঁছানো অসম্ভব। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকসমূহের আধেয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে শতভাগ জেন্ডার সংবেদনশীল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের স্বপ্নকে সম্ভব করে তুলতে এ বিষয়ক তথ্য যত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে ততই মঙ্গল। এই যুক্তি ও সংশ্লিষ্টতার সুবাদে আমি সর্বশেষ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 'নারী ও প্রগতি'র অগ্রসর পাঠকদের জন্য সংক্ষিপ্ত এই নিবন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের সারাংশ তুলে ধরার প্রয়াস করছি। আশা করি এটি সম্মানিত পাঠকদের আমাদের মাধ্যমিক স্তরের চলমান পাঠ্যপুস্তকের আধেয়ের চরিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরের একটি ধারণা হলেও দিতে পারবে, যা পাঠ্যপুস্তকের আধেয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে মতগঠনে সহায়ক হবে।

বলাই বাহুল্য যে, উল্লিখিত গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গবেষণার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারিত ৯৩টি পাঠ্যপুস্তক থেকে নমুনা হিসেবে ২৮টি বই নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত নমুনা বইয়ের যাবতীয় আধেয় (টেক্সট, ছবি, গ্রাফিক্স, ইলাস্ট্রেশন, ইত্যাদি) বিশ্লেষণ করা হয়। সরকারের সর্বশেষ শিক্ষানীতি অনুসারে প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়টি স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয় ২০১৩ সালে। সেই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠ্য 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য'বিষয়ক বইয়ের আধেয়ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে কিছু গণমাধ্যমে স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রজননস্বাস্থ্য-বিষয়ক অংশটিকে 'অহেতুক যৌনশিক্ষা' এবং এটিকে সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হিসেবে অভিযুক্ত করে এর সমালোচনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য

লিখিত প্রজননস্বাস্থ্য অংশটির উপযোগিতা ও যথার্থতা যাচাই করাও আলোচ্য গবেষণার দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বিষয়ভিত্তিক আধেয় বিশ্লেষণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক স্তরের বাংলা বইগুলোর (বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি : ষষ্ঠ শ্রেণি; আনন্দপাঠ (বাংলা দ্রুতপঠন) : অষ্টম শ্রেণি; মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য (গদ্য-পদ্য) : নবম-দশম শ্রেণি) আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইগুলোর রচনা ও সম্পাদনায় নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কণে জড়িত সবাই পুরুষ। বইগুলোতে ব্যবহৃত চিত্রে পুরুষ চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। সাহিত্য বইয়ে (আনন্দপাঠ : অষ্টম শ্রেণি) কাহিনি নির্বাচনে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয় নি। বইয়ে ৮টি গল্প সংকলন করা হয়েছে। গল্পগুলোর প্রতিটিতেই প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে পুরুষ। পুরুষ লেখক ও কবিদের তুলনায় যেখানে নারী লেখক ও কবিদের সংখ্যা কম। মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য (নবম-দশম শ্রেণি) বইয়ে সন্নিবেশিত ৩১টি গদ্যের মধ্যে মাত্র তিনটির লেখক নারী, অপরদিকে ৩১টি পদ্যের মধ্যে একটিমাত্র কবিতার কবি নারী।

দেখা গেছে, বেশির ভাগ গদ্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রে পুরুষপ্রাধান্য রয়েছে। নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বইয়ে নির্বাচিত ৩১টি গদ্যের মধ্যে ৬টি ব্যতীত ২৫টি গদ্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রই পুরুষ। পুরুষকে কেন্দ্র করে গল্পের অবতারণা। মাত্র ৬টি গদ্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রে নারী রয়েছে। এসব গদ্যের ৫টির মধ্যেই নারীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনগাথা বর্ণিত হয়েছে, যার ভেতরে নারীর সনাতনী দুর্বল চিত্রই এখানে ফুটে উঠেছে। সৃজনশীল প্রশ্ন অংশে নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্রের সংমিশ্রণ থাকলেও পুরুষ চরিত্রগুলোকে শক্তিশালী করে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুরুষ চরিত্রকে প্রধান ও সবল দেখানোয় এখানে সাহিত্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি প্রয়োগের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। এই শিক্ষার্থীরা যখন নিজেরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাইবে, আশঙ্কা হয় যে তখন অবচেতন মনেই নারী চরিত্রকে অসহায়, উপেক্ষিত, দুর্বল ও ক্ষমতাহীন হিসেবে উপস্থাপন করবে।

ব্যাকরণ বইয়ের বিভিন্ন উদাহরণে অপ্রাসঙ্গিকভাবে পুরুষ চরিত্রকে টেনে আনা হয়েছে। আর যেসব উদাহরণে নারী চরিত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোতে আবার নারীর অসহায়ত্বের ছবিই ফুটে উঠেছে। ব্যাকরণ বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক হচ্ছে, শব্দের শ্রেণিবিভাগে (পৃষ্ঠা ৪২, ৩.৭) 'পুরুষ' শব্দের বিকল্প হিসেবে 'পক্ষ' শব্দের ব্যবহার। 'উত্তম পুরুষ'-এর বিকল্প হিসেবে 'বক্তা পক্ষ', 'মধ্যম পুরুষ'-এর বিকল্প হিসেবে 'শ্রোতা পক্ষ' এবং 'নাম পুরুষ'-এর বিকল্প হিসেবে 'অন্যপক্ষ' ব্যবহার করা হয়েছে। এই সচেতন ব্যবহারটি খুবই ইতিবাচক।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ইংরেজি বই দুটির (English Grammar And Composition : সপ্তম শ্রেণি; English For Today : অষ্টম শ্রেণি) আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইগুলোর রচনা ও সম্পাদনায় নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। দেখা গেছে, সামাজিক মর্যাদা অনুসারে পুরুষের নামের শুরুতে 'ড.' আর নারীর নামের শুরুতে 'মিসেস' ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে নারীর সনাতনী রূপ ফুটে উঠেছে। এখানে মা হিসেবে সন্তানের তদারকি করা, রান্না করা, দৈহিক অবয়ব চিকন হওয়া, ইত্যাদি সনাতনী ধারণাগুলোর পুনরুৎপাদন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যময় ও সুখী পরিবারে একজন মাকে ভালো রাঁধুনী হতে হবে— পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে এ বিশ্বাস থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনতে হবে। পরিবারের বাবা কিংবা অন্যরাও এ ব্যাপারে সমান ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু তা না করায় ইংরেজি শিক্ষার মূল লক্ষ্যই এখানে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীর পক্ষে এ ধরনের

দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য উন্নত দেশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না, যা আমাদের শিক্ষার্থীদের ওইসব দেশের শিক্ষার্থীদের থেকে অনেক পেছনে ফেলে দেবে। এছাড়াও, ইংরেজি বইয়ে নারী দুর্বল আর পুরুষ শক্তিশালী ও চালকের আসনে অধিষ্ঠিত— এমন ধারণা-সম্বলিত উদাহরণ টানা হয়েছে। বই দুটোর রচনায় পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। সপ্তম শ্রেণির ইংরেজি বইয়ে The Lady with the Lamp শীর্ষক দ্বিতীয় রচনাটি লেখা হয়েছে Florence Nightingale-এর ওপর। সমাজসেবায় বিস্মৃতপ্রায় নারীর অবদান এখানে উঠে এসেছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক। অষ্টম শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের Unit Two-এর Food and nutrition শীর্ষক অংশে নারীকে শিক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ইতিবাচক।

নবম-দশম শ্রেণির গণিতের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইটির রচনা ও সম্পাদনায় নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। অনুশীলনীর উদাহরণগুলোতে 'শিক্ষার্থী' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক। অঙ্কের উদাহরণগুলোতে নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। পিতা-পুত্রের বয়সসংক্রান্ত সনাতনী ধারার অঙ্কের পাশাপাশি মাতা-কন্যার বয়সসংক্রান্ত অঙ্কও গণিতের বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ইতিবাচক।

বিজ্ঞানের বইগুলোর (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : সপ্তম শ্রেণি; বিজ্ঞান : নবম-দশম শ্রেণি; জীববিজ্ঞান : নবম-দশম শ্রেণি) আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইগুলোর রচনা ও সম্পাদনায় নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কণে জড়িত সবাই পুরুষ। সপ্তম শ্রেণির 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বইয়ে নারী ও পুরুষের ছবির ব্যবহারে সচেতনভাবে ভারসাম্য আনা হয়েছে। তবে এই বইয়ে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত নমুনা প্রশ্নে যেসব চরিত্র উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর সবই মেয়ে। নবম-দশম শ্রেণির 'বিজ্ঞান' বইয়ে গৃহকর্মের দায় নারীর— এমন সনাতনী ধারণার পুনরুৎপাদন করা হয়েছে। বইয়ের একটি ছবিতে (চিত্র : ৪.৮, পৃষ্ঠা ৭৩) একজন গর্ভবতী নারীকে হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে মাটিতে বসে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে : 'গর্ভধারণের ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা খুব কষ্টকর হয়'। ঘরের কাজকর্মগুলোকে এসময়েও নারীর জন্যে স্বাভাবিক কাজকর্ম হিসেবে চিত্রিত হতে দেখা যায়। অধিকন্তু, এ ছবি শিক্ষার্থীদের, বিশেষত মেয়েশিক্ষার্থীদের মনে আতঙ্কের জন্ম দিতে পারে। ছবিতে গর্ভবতী মা নিয়মিত ফলমূল ও পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছে এবং অন্যরা তার নিজের কাজগুলো ভাগাভাগি করে করে নিচ্ছে— এমনটি দেখালে তা খুবই ফলপ্রদ হতো।

কঠিন কাজে পুরুষ— এমন প্রচলিত ধারণা পুনরুৎপাদন করা হয়েছে বিজ্ঞান বইয়ে। একটি ছবিতে (চিত্র : ৫.১) 'নিরাপদ ড্রাইভিং' কথাটির বর্ণনা হিসেবে একজন পুরুষ চালককে গাড়ি চালানোর দৃশ্যে দেখা যায়। নারীরা ঠিক চালক নয়— এই প্রথাগত ও ভ্রান্ত ধারণাটি আঁকিয়ের মনে যে ছাপ ফেলেছে, তা এখানেও প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'নারী শিক্ষা' অধ্যায়ে মেয়েদের 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা', 'কারিগরী শিক্ষা' ও পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ধরে রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত চিত্রে সে বিষয়টি আসে নি। মেয়েদের সমানভাবে বিবেচনা করা হয় নি। এছাড়া, ব্যবহৃত উদাহরণগুলোতেও পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে।

ধর্ম বইগুলোর (বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : ষষ্ঠ শ্রেণি; খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : সপ্তম শ্রেণি; হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি; ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা : নবম-দশম শ্রেণি) আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইগুলোর রচনা ও সম্পাদনায় নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। বিশেষত নবম-দশম শ্রেণির ধর্ম বইটির রচনা ও সম্পাদনার কোনো পর্যায়েই নারীর সম্পৃক্ততা নেই। ষষ্ঠ শ্রেণির 'বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ের

কয়েকটি ছবিতে উপাসক-উপাসিকা হিসেবে নারী-পুরুষ উভয় চরিত্র উপস্থিত, যা ইতিবাচক। সপ্তম শ্রেণির 'খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ে ছবির উপস্থাপনে এই ভারসাম্য রক্ষা করা হয় নি। ষষ্ঠ শ্রেণির 'বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ে নারী মানে সংসারী, গৃহস্থালির কাজে সদা ব্যস্ত এবং পুত্রসন্তান কামনার সমাজ প্রচলিত সনাতনী ধ্যান-ধারণায় বৃত্তাবদ্ধ। এখানে নারীকে 'মহিলা' হিসেবে সম্বোধন করে নারীর কুটিল রূপ তুলে ধরা হয়েছে। নারী হলেন 'পুণ্যবতী মহিলা'— এমন প্রথাগত ধারণার প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নাবলি অংশে পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্য রয়েছে এবং ইতিবাচক চরিত্রেও পুরুষের সংশ্লিষ্টতা নারীর চেয়ে বেশি। পাশাপাশি বইটির মূল পাঠের (টেক্সট) বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন চরিত্রের যে প্রসঙ্গ ও উদাহরণ এসেছে, তা প্রায় সর্বাংশেই পুরুষ বা পুরুষনির্ভর। সপ্তম শ্রেণির 'খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ে এ ধর্মে পুরুষই প্রধান— এমন ধারণা ফুটে উঠেছে। এখানে প্রশ্নাবলি অংশে পুরুষ চরিত্রকে সক্রিয় আর নারী চরিত্রকে নিষ্ক্রিয় দেখানো হয়েছে। পুরুষকে পরিশ্রমী আর নারীকে কোমল করে তুলে ধরা হয়েছে। নারীর অধস্তনতার স্বাভাবিকীকরণ করা হয়েছে। নারী পরিচয়কে শেষ বিচারে পুরুষের স্ত্রী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণির 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ের 'আদর্শ জীবনচরিত'-এ শুধু পুরুষদের জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত সৃজনশীল প্রশ্নে উল্লিখিত সব চরিত্রই পুরুষ।

ইতিহাস বিষয়ক বইগুলোর (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি : ষষ্ঠ শ্রেণি; বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা : নবম-দশম শ্রেণি; বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় : নবম-দশম শ্রেণি) আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ষষ্ঠ শ্রেণির 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি' বইয়ে নারী ও পুরুষ উভয়ের ছবি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বইটিতে স্বতন্ত্র ও অনন্য জাতিসত্তা হিসেবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতি অত্যন্ত ইতিবাচক। নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা' বইটিতে সংযোজিত সৃজনশীল প্রশ্ন অংশে নারী ও পুরুষের চরিত্রের উপস্থিতিতে ভারসাম্য আনা হলেও প্রশ্নের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নারী চরিত্রগুলো পুরুষের তুলনায় দুর্বল। তবে বইটিতে বাংলার নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা বিবৃত হয়েছে। এখানে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও হাজী মুহম্মদ মহসীন প্রমুখের ভূমিকার পাশাপাশি বেগম রোকেয়ার ভূমিকাও উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষুদিরাম, মাস্টারদা সূর্যসেনের অবদানের পাশাপাশি কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাহসী ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করা যায়, নারীর এই শক্তিশালী চরিত্র শিশুশিক্ষার্থীদের যেমন অনুপ্রেরণা জোগাবে, তেমনি নারীর প্রতি তাদের মনে বাড়তি সম্মানবোধেরও জন্ম দেবে।

নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা' বইতে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বীরপ্রতীক সিতারা বেগম ও তারামন বিবির নাম শিশুশিক্ষার্থীদের মনে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দেবে। অনুরূপভাবে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়েও মুক্তিযুদ্ধে নারী অবদানের স্বীকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের এ স্বীকৃতি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মনে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করবে। মুক্তিযুদ্ধ যে কেবল পুরুষের যুদ্ধ ছিল না, এটি নারী-পুরুষের সম্মিলিত যুদ্ধ ছিল, সে ব্যাপারে তাদের ধারণাকে স্পষ্ট করবে।

নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইটিতে 'জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ' অধ্যায়ে সিডও সনদের সংযোজন শিক্ষার্থীদের নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ইস্যু সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। বইটিতে নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ এ দলিলের সংযোজন নিঃসন্দেহে জেন্ডার সংবেদনশীলতার মাপকাঠিতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে বিবেচিত। আবার এই বইয়ে 'বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন'

অধ্যায়ে সমাজ পরিবর্তন ও নারীর ভূমিকা শীর্ষক উপশিরোনামে শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানে নারীরা এগিয়ে চলেছে। পুরুষের পাশাপাশি বহুমাত্রিক দায়িত্বও পালন করছে তারা। পাঠের এ বিবরণের পাশাপাশি 'নারী শিক্ষার অগ্রগতি' ও 'আত্ম-কর্মসংস্থানে নারী' ক্যাপশনে দুটি ছবিও ব্যবহার করা হয়েছে, যার সংযোজন সর্বার্থেই ইতিবাচক।

নবম-দশম শ্রেণির 'ভূগোল ও পরিবেশ' বইয়ের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইটিতে ব্যবহৃত ছবিগুলোতে নারী চরিত্রের উপস্থিতি কম ও পুরুষ চরিত্রের উপস্থিতি বেশি। বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে যেসব সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলোই পুরুষ লেখকদের থেকে নেওয়া। নারী লেখকের দেওয়া কোনো সংজ্ঞা এখানে পাওয়া যায় নি। দেশে না-হলেও বিদেশে অনেক খ্যাতিমান নারী ভূ-বিদ্যাবিশারদ রয়েছেন। তাদের এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বিষয়টির সঙ্গে নারীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও অপরিহার্যতার কথা শিক্ষার্থীরা জানতে পারত। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ভূ-বিদ্যা, (বিশ্ব)ভ্রমণ বা এ ধরনের অভিযাত্রা বিষয়ে নারীদের সম্পৃক্ততা থাকলেও স্বীকৃতি ছিল না এবং নারীদের এ ধরনের কোনো পেশাদার সংগঠনের সদস্যপদও দেওয়া হতো না। কিন্তু চারজন ভূ-বিদ ও অভিযাত্রী নারীর দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হিসেবে পরে এ শাস্ত্রে নারীদের অপরিহার্যতার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়। অধিকন্তু, বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নাবলি অংশে যেসব চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই পুরুষ। অল্প কয়েকটি চরিত্রে নারীর উল্লেখ পাওয়া গেছে।

নবম-দশম শ্রেণির 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং' এবং 'অর্থনীতি' বই দুটির রচনা ও সম্পাদনায় সংখ্যাগত দিক থেকে নারীর চেয়ে পুরুষ বেশি। আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, 'ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং' বইয়ে প্রতিটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত পাঠ শেষে 'দলীয় কাজ' অংশে 'শিক্ষার্থী' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ইতিবাচক দিক। বইটির মূলপাঠে নারী চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় নি। তবে উদ্দীপক ও সৃজনশীল অংশে উদাহরণ হিসেবে নারী ও পুরুষ চরিত্রে ভারসাম্য আনা হয়েছে। 'অর্থনীতি' বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নাবলি অংশে ছেলে-মেয়ে (নারী-পুরুষ)— উভয় চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে, তবে এখানেও পুরুষ চরিত্রের আধিক্য লক্ষ করা গেছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নাবলি অংশে একটি উদাহরণে (পৃষ্ঠা ৭০) বলা হয়েছে, 'মিসেস ব্রাউনী বৃটেনের নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতি মাসে তিনিও তার দেশে টাকা পাঠান।' এই উদাহরণে অর্থনীতিতে নারীর সংশ্লিষ্টতার ধরন বাহ্যিকভাবে ইতিবাচক মনে হলেও আমাদের অর্থনীতিতে এ ধরনের উদাহরণ কাম্য নয়। বিদেশি মেয়ের উদাহরণ না-দিয়ে বরং কোনো বাংলাদেশি মেয়ে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত ও দেশে টাকা পাঠাচ্ছে এবং এতে দেশে রেমিটেন্সের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে— এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য গড়ে তোলা দরকার।

নবম-দশম শ্রেণির 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা' বইয়ের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইটির 'নাগরিকের অধিকার' শীর্ষক অংশে ৩টি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে শিক্ষা ও ভোটাধিকার সংশ্লিষ্ট চিত্রে নারীর উপস্থিতি ইতিবাচক। পাশাপাশি পরিবার গঠনের অধিকার-সংশ্লিষ্ট চিত্রে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের ছবি রয়েছে, যেখানে সন্তানকে পুরুষটির কোলে দেখা যায়। এ ধরনের ছবি ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সহায়ক। তবে 'বিশ্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা' শীর্ষক অংশের সঙ্গে বিভিন্ন মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণের দুটি ছবির একটিতেও কোনো নারীসদস্যের উপস্থিতি নেই। অথচ বাংলাদেশের নারী সেনাসদস্যরা জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনে গুরুত্বপর্ণ অবদান রেখে বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা বয়ে এনেছেন। বইটির প্রশ্নাবলি অংশে বিভিন্ন উদাহরণেও পুরুষ চরিত্রের আধিপত্য লক্ষ করা গেছে।

সপ্তম শ্রেণির 'কৃষিশিক্ষা' বইটির আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সনাতনী ধারণায় কৃষক বলতে একজন পুরুষকে বোঝায়। বইটির প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিতে এ ধারণারই পুনরুৎপাদন ঘটেছে। তবে বইটিতে ব্যবহৃত নারী-পুরুষের ছবিগুলোতে ভারসাম্য আনা হয়েছে। বইটির পাঠে কৃষিকাজে নারীর অবদানের কথা স্বীকার করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের মনে পরিবার ও সমাজ গঠনে নারীর অবদান ও স্বীকৃতি সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণার বীজ রোপিত হবে। কেননা শিশুদের সামাজিকীকরণে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বইটির প্রতিটি অধ্যায় শেষে অনুশীলনীতে যেসব সৃজনশীল প্রশ্ন সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলোর আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অধিকাংশ চরিত্রই পুরুষের। পুরুষ চরিত্রগুলোর সবাই কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত। বিপরীতে নারী চরিত্র মুরগি পালনের সঙ্গে জড়িত। বর্ণনাদৃষ্টে মনে করা অসংগত হবে না যে, ব্যবসায় কিংবা কৃষি পুরুষদের আর নারীদের কাজ কেবল মুরগি পালন। নারীরাও যে কৃষি ও ব্যবসায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা এখানে তুলে আনা দরকার।

নবম-দশম শ্রেণির 'চারু ও কারুকলা' বইয়ের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইটির রচনা ও সম্পাদনায় সংখ্যাগত দিক থেকে নারীর চেয়ে পুরুষ বেশি। বইয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'মুক্তিযোদ্ধা' ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে সবাই পুরুষ। নারীও প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তাই এখানে নারীরও উপস্থিতি রয়েছে, এমন কোনো ছবি ব্যবহার করা উচিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক পোস্টার আঁকা হয়েছে, যেখানে নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে। সেগুলো প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেত। বইয়ে কাঠ কেটে পুতুল তৈরির বর্ণনায় একজন নারীর প্রতিকৃতি লক্ষ করা গেছে। 'পুতুল' বলতে নারীকে বোঝা অর্থাৎ নারীকে 'পুতুল' ভাবাটাও জেন্ডারপক্ষপাতের দোষে দুষ্ট। ফ্যাশন ডিজাইন সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে উদাহরণ হিসেবে একটি টি-শার্ট ও একটি সালোয়ার-কামিজের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ছেলে ও মেয়ের পোশাকের ছবিতে ভারসাম্য আনা হয়েছে। এছাড়া ৮৩ পৃষ্ঠায় বাঁশের চাটাই ও ঝুড়ি তৈরির দৃশ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের উপস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ। ফলে বিদ্যমান বাস্তবতার সঠিক উপস্থাপন এতে লক্ষ করা গেছে। কেননা বাস্তবেও এ কাজটি নারী-পুরুষ উভয়েই করে থাকে। বইটিতে শিশুরা কীভাবে খাতায় গ্রামের ছবি ফুটিয়ে তোলে তার বর্ণনার একটি অংশে মেয়েদের নদী থেকে পানি নিয়ে আসার দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। এই বর্ণনায় পানি আনার কাজটি কেবল মেয়েদেরই, শিক্ষার্থীদের মনে এই ধারণাটি স্বাভাবিক বলে মুদ্রিত হয়ে যেতে পারে। বইয়ের শিল্পী হিসেবে পুরুষের নাম উঠে আসার পাশাপাশি তাঁদের আঁকা নারীবিষয়ক বা নারীনির্ভর ছবিগুলোর নামও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী এখানে শুধু পুরুষ স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণির 'কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা' বইয়ের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইটির প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিতে নারীর শক্তিশালী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বইয়ের কয়েকটি অংশে ঝাড়ু ও রান্নার কাজে নারীর সনাতনী রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এসব কাজে পুরুষের সম্পৃক্ততার বিষয়টিও পাঠে তুলে ধরতে হবে। কায়িক শ্রম ও মেধাশ্রমে নারীকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে কায়িকশ্রম ও মেধাশ্রমের যতগুলো ক্ষেত্র রয়েছে, তার সবকটিতেই নারীরা পুরুষের সমঅংশীদার। তাই এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের ছবি ব্যবহার করাই শ্রেয়। বইটিতে ছেলে-মেয়ের ছবির উপস্থাপনে ভারসাম্য আনা হয়েছে। অনুরূপভাবে গল্প ও ঘটনার চরিত্র নির্বাচনে সচেতনভাবে ভারসাম্য আনা হয়েছে। বইয়ের কয়েকটি অংশে ঘর গোছানো ও কাপড় ধোয়ার মতো গৃহস্থালি কাজে পুরুষের সম্পৃক্ততার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক। এছাড়া, মায়েদের পারিবারিক কাজের স্বীকৃতিমূলক পাঠ বইটিতে সংযুক্ত হয়েছে। বইয়ের একটি জায়গায় (পৃষ্ঠা ৩৫) বলা হয়েছে : 'অনেক মায়েরা সরাসরি চাকরি বা ব্যবসা না করে ঘরে ও বাইরে বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক কাজ করে থাকেন, যাতে পরিবারের অনেক উপকার হয়। যেমন : সন্তান লালন-পালন, রান্না করা, বাজার

করা, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, ফসল তোলা ও সংরক্ষণ, বীজ সংরক্ষণসহ অন্যান্য কৃষিকাজে সহায়তা করা। মায়েদের এসব কাজের মাধ্যমেও পরিবারের আয় হয়।' পাঠের এ বর্ণনা পরিবারে মায়েদের কাজ সম্পর্কে শিশুশিক্ষার্থীদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

'গার্হস্থ্য বিজ্ঞান' বইয়ের পাঠ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঘরমোছা ও রান্নার কাজ নারীর— বইটিতে এই সনাতনী চিত্র ফুটে উঠেছে। গৃহব্যবস্থাপনার কাজ কেবল নারীর— এমন একটি ধারণা বইয়ের পাঠে ফুটে উঠেছে। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণে 'গার্হস্থ্য বিজ্ঞান' বইয়ে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। এ বইটি কেবল মেয়েদের পাঠ্য এ ধারণা থেকে বের হওয়ার জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণে কিংবা শিরোনামে পরিবর্তন আনা উচিত, যাতে ছেলেরাও গৃহব্যবস্থাপনা, রান্না, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশু পালন ও পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী হয়।

শারীরিক শিক্ষা ও প্রজননস্বাস্থ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক স্তরে 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' বিষয়ে চার শ্রেণিতে চারটি পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে : শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (ষষ্ঠ শ্রেণি); শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (সপ্তম শ্রেণি); শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (অষ্টম শ্রেণি) এবং শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা (নবম-দশম শ্রেণি)। এ বইগুলোর আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বইগুলোর রচনা ও সম্পাদনায় জড়িত সবাই পুরুষ।

সার্বিকভাবে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে চারটি শ্রেণির উল্লিখিত চারটি বইয়ের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ষষ্ঠ শ্রেণির 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' বইয়ে উপস্থাপিত ছবিতে নারী ও পুরুষের সংমিশ্রণ রয়েছে। তবে ফুটবল, ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক্সে ছেলেদের লক্ষ করা গেছে। একইভাবে সপ্তম, অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণির বইয়ে খেলাধুলা অংশে (ফুটবল খেলা, ভলিবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, জিমন্যাস্টিক্স) প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে ছেলেদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও পাঠের বর্ণনায় এসব খেলায় নারী-পুরুষের ভেদাভেদ করা হয় নি। তবে নবম-দশম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা বইয়ে অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতারে ব্যবহৃত ছবিগুলোতে নারী ও পুরুষ উভয় চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। উল্লেখ্য, সকল শ্রেণির বইয়ে খেলাধুলা অংশে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, জিমন্যাস্টিক্সে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ছবি প্রয়োজন। ক্রিকেটে, এভারেস্ট বিজয়ে বাংলাদেশের নারীদের ভূমিকা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রতিটি খেলার বর্ণনা, নিয়মকানুন, মাঠের চিত্র, কৌশল ব্যাখ্যার শেষে যেসব খেলোয়াড় (নারী-পুরুষ উভয়েই) বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরছে, তাঁদের নাম ও কাজের বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরা প্রয়োজন। যেমন, সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নারী এভারেস্ট বিজয়ীর (নিশাত মজুমদার) নাম। পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রথম যিনি এভারেস্ট বিজয় করেছেন তাঁর নাম। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক দলগুলোর সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়েছে। প্রতিটি খেলায় এরকম দু'-একটি বাক্যে সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ পাবে এবং নারীর কৃতিত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারবে, যা তাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং আত্মমর্যাদাবোধ ও সাহস বাড়াবে।

'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য'সংক্রান্ত বইগুলোতে প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, সেগুলো সময়োপযোগী। এই বয়সে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আলোচ্য পরিবর্তনগুলো সূচিত হয়। তাই এগুলো নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত খোলামেলা আলোচনা জরুরি। এসব বিষয় সঠিক সময়ে না-জানার কারণে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি ও বিষণ্নতা কাজ করে। এ বয়সে অনেকে শারীরিক-মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তনগুলোকে স্বাভাবিক মনে করে না। যৌনতা বিষয়ে আমাদের সমাজে এখনো খোলামেলা

আলোচনা হয় না। মনে রাখতে হবে, একবারে একদিনে এই ট্যাবু ভাঙার চেষ্টা করলে ফল বরং উলটো হবে। বিশেষ করে, গ্রামে ও শহরের দরিদ্র পরিবারগুলোতে শিক্ষাবঞ্চিত বা অল্পশিক্ষিত মা-বাবার মধ্যে এমনিতেই সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে অনীহা রয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা বিপাকে পড়ে যায়। অনেকে আবার বিপথগামী হয়ে যায়। তাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত শিক্ষা ও দীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে এ-বিষয়ক পাঠের সংযোজন তাই সময়ের দাবি। তবে বিষয়গুলো যেহেতু আমাদের সমাজব্যবস্থায় স্পর্শকাতর ও অনেকটাই গোপনীয়, সেহেতু তার বর্ণনার আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গিতে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। বর্ণনার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব শালীন ও সাবলীল হওয়া দরকার। শব্দচয়নে সর্তক হওয়া উচিত। তাই জরুরি বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায় না-রেখে বা বাতিল করে না-দিয়ে এর উপস্থাপনা কী উপায়ে পরিমার্জিতভাবে করা যায়, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত।

গবেষণার ফলাফল

গবেষণায় বিষয়ভিত্তিক আধেয় বিশ্লেষণ থেকে যে ফলাফল পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনায় নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশি। শতাংশের হিসেবে নারীর সংখ্যা মোট রচয়িতা ও সম্পাদকের ২৫.১৮ শতাংশ এবং পুরুষের সংখ্যা ৭৪.৮২ শতাংশ। প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কণেও একই চিত্র পাওয়া গেছে।

পাঠ্যপুস্তকে নারী বা মেয়েশিশুর কিছু ইতিবাচক দিক হচ্ছে, ছবির উপস্থাপনে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে; প্রচ্ছদে নারীর শক্তিশালী চিত্র ফুটে উঠেছে; গৃহস্থালির কাজে নারীর পাশাপাশি পুরুষেরও অংশগ্রহণের ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে; মায়েদের পারিবারিক কাজের স্বীকৃতির বর্ণনা পাওয়া গেছে; শিক্ষায় খ্যাতিমান নারী-পুরুষ উভয়ের কথা এসেছে; কৃষক হিসেবে নারীর অবদানের কথা স্বীকার করা হয়েছে; ধর্মশিক্ষায় নারীর প্রতি সম্মানের গুরুত্ব বিবৃত হয়েছে; গণিতের বইয়ে মাতা-কন্যার বয়সসংক্রান্ত অঙ্ক সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে নারী অবদানের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

বিপরীতে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে নারী বা মেয়েশিশুর প্রতি যেসব নেতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, নারীর সনাতনী রূপ তুলে ধরা হয়েছে; কায়িকশ্রম ও মেধাশ্রমে নারীর উপস্থিতি নেই বললেই চলে; আদর্শ জীবনচরিতে নারীর কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় নি; সৃজনশীল প্রশ্নে নারী চরিত্রের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে খুবই কম; গৃহব্যবস্থাপনার কাজ কেবলই নারীর— এরূপ ধারণাসম্বলিত টেক্সট পাওয়া গেছে।

২০১২ সালে করা বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ-এর গবেষণায় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত নমুনায়নের ভিত্তিতে ১৮টি পাঠ্যপুস্তকের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। বর্তমান গবেষণার প্রধান প্রধান ফলাফলের সঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণার প্রধান প্রধান ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমান পাঠ্যসূচিতে 'ছাত্র' বা 'ছাত্রী' বা 'ছাত্রছাত্রী'র মতো দ্বিবিভাজিত শব্দ পরিহার করে সাধারণ শব্দ 'শিক্ষার্থী' ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা বইয়ে নারীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। পূর্বের পাঠ্যসূচির মতো এখানে ঢালাওভাবে নারীর কুটিল রূপ তুলে ধরা হয় নি। তবে আদর্শ ব্যক্তিত্ব অংশে পূর্বের পাঠ্যসূচির মতো এখনো আদর্শ নারী অনুপস্থিত। সৃজনশীল প্রশ্ন অংশে নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রই বর্তমান পাঠ্যসূচিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে নবম-দশম শ্রেণির 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ের এ

অংশে শুধু পুরুষ চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান পাঠ্যসূচিতে প্রতিটি শ্রেণিতে 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' নামে নতুন বই সংযোজন করা হয়েছে। এ বইয়ে প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বর্ণনার ভঙ্গি ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে আরো সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান পাঠ্যসূচিতে মায়েদের পারিবারিক কাজের স্বীকৃতি, কৃষিকাজে কৃষক হিসেবে নারীর অবদানের স্বীকৃতি, সর্বোপরি সামাজিক পরিবর্তনে নারীর অবদানের স্বীকৃতি বিবৃত হয়েছে। নব জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনে নারীর অবদানের কথা বর্তমান পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনে নারীর ভূমিকা ইতিবাচকভাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমান পাঠ্যসূচির কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদচিত্রে নারীর শক্তিশালী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান পাঠ্যসূচির একটি বইয়ে ঘর মোছা ও কাপড় ধোয়ার মতো ঘরোয়া কাজে নারীর সনাতনী রূপ ভেঙে পুরুষকে এ কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুপারিশ

প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা গবেষণায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রস্তাব করেছি। তার কয়েকটি হলো : চিত্রে নারী ও পুরুষের ভারসাম্য আনতে হবে; পাঠে কায়িক শ্রম ও মেধাশ্রমে নারীর অবদান সংযোজন করতে হবে; পাঠ্যপুস্তক থেকে পুত্রসন্তান কামনার মতো পুরুষতান্ত্রিক ধারণা বাদ দিতে হবে; নারী সম্পর্কে 'স্ত্রীলোক', 'গৃহবধূ' ও 'কুটিল'— এ ধরনের শব্দ বাদ দিতে হবে; গৃহস্থালি কাজে নারীর সনাতনী রূপ ভেঙে এক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে; আদর্শ জীবনচরিতে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; সৃজনশীল প্রশ্নে নারী ও পুরুষ চরিত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে; সাহিত্যের বইয়ে কবি ও লেখক হিসেবে নারীদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হবে; ব্যাকরণের উদাহরণে নারী ও পুরুষ উভয়ের সন্নিবেশ ঘটাতে হবে; গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বইয়ের আধেয় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য হতে হবে এবং প্রজননস্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ের উপস্থাপনে আরো সচেতনতা দরকার।

আশা করা যায়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)সহ পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট সকল মহলের তত্ত্বাবধানে ক্রমশ বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক থেকে সমুদয় জেন্ডার অসংবেদনশীল উপাদান অপসারণ করে সবদিক থেকে গ্রহণযোগ্য শতভাগ জেন্ডার সংবেদনশীল পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে উঠতে পারবে।

মুহাম্মদ আনওয়ারুস সালাম গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। salam.anwar@yahoo.com